Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 7, Issue - 12, December - 2024

DOIs:10.2018/SS/202412015 --:-- Research Paper / Article / Review

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতে বিজ্ঞানচেতনা : একটি অনুসন্ধান

ড. সুপেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম, ভারত
Email - supendra.khalaigram@gmail.com

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি। তিনি এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখকও। তাছাড়াও তাঁর আরও একটি সত্তা রয়েছে তা হল বৈজ্ঞানিক সত্তা। তথাকথিত অর্থে তিনি বিজ্ঞানী নন। তবে তিনি প্রখরভাবে বিজ্ঞানমনস্ক এবং বিজ্ঞান সচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে এও বুঝেছিলেন যে, ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পৃথিবী। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন হবে কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিজ্ঞানমনস্কতার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর আধুনিক মনভাবাপন্ন পারিবারিক পটভূমি যেখানে ঠাকুর পরিবারের ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিজ্ঞানমনস্কতা কীভাবে তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এই সন্দর্ভে আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দ : জীবনস্মৃতি, শিশু পত্রিকা, পিতার প্রভাব, সাহিত্য ও সঙ্গীতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানের সুফল.

সময়টা উনবিংশ শতক। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলায় বিজ্ঞানের আমদানি হয় ইংরেজদের হাত ধরে। উনিশ শতকের কলকাতা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করত। বিজ্ঞানচর্চা এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই সময় অসংখ্য বিজ্ঞানধর্মী প্রবন্ধ সেসময়ের পত্রিকগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'জ্ঞানোদয়', 'বিজ্ঞানসেবধি', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকা বিজ্ঞানচর্চার জন্য জনপ্রিয় ছিল। তবে শুধুমাত্র লেখার ক্ষেত্রেই এই বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিজ্ঞান নিয়ে নানা আলোচনাসভাও আয়োজিত হত। আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার এই সূচনালগ্নে মূলত একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১-১৯৪১) বিজ্ঞানচর্চা একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, সঙ্গীতকার ও দার্শনিক। এর পাশাপাশি তিনি প্রবলভাবে বিজ্ঞানমনস্ক। তবে সাহিত্যজগতের মানুষ হয়ে কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তা জানার জন্যে আমাদের ফিরে যেতে হয় তাঁর অতীত বাল্য ও কৈশোর কালের দিকে। জানতে পারি ঠাকুর পরিবারে আগাগোড়া বিজ্ঞানচর্চার একটি উদার পরিমণ্ডল ছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরসন্ধানী হলেও ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর সহযোগিতায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে যে 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকা হয় তার অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়ই ছিল বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। এই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই ঠাকুরবাড়ির বালকদের শিক্ষার মুখ্য বিষয় হয় উপনিষদ ও বিজ্ঞান। সেখানে অন্যান্য বালকদের মতো রবীন্দ্রনাথকেও গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মিত পাঠ নিতে হত। এমনকি এই বাল্যকালেই এক শিক্ষক কঙ্কাল দেখিয়ে মানব দেহের

খুঁটিনাটি সম্পর্কে বালকদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। এই শিক্ষাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে 'কঙ্কাল' গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করে। শুধুই কি কঙ্কাল? মানব দেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নিতে মেডিক্যাল কলেজে গিয়েও লাশকাটার আদ্যপ্রান্ত দেখতে হত বালকদের। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন-

> 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সেকথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না'[১](উৎসর্গ অংশ, বিশ্বপরিচয়)।

অল্প বয়সে এই জটিল শিক্ষাপদ্ধতি কোনোভাবেই বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করত না বরং তিনি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তা গ্রহণ করতেন। এবং কোনোদিন গৃহশিক্ষক সীতানাথ দত্ত না এলে সেই দিনটি তাঁর কাছে বৃথা যেত বলে মনে করতেন-

> 'যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'[২]

১৮৭৩ সালে ১২ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাড়ির বাইরে বের হন। উদ্দেশ্য হিমালয় যাত্রা। ডালহৌসিতে থাকার সময় তিনি প্রথম পিতার কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নেন। বিকালে ডালহৌসি পাহাড় ঘুরে এসে সন্ধ্যাবেলা পিতা দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে গ্রহ-নক্ষত্র চেনাতেন। উল্লেখ্য যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়েও পিতার কাছ থেকে পাঠ নিতেন বালক রবীন্দ্রনাথ। কবি লিখেছেন-

> 'তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে··· পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন'[৩](উৎসর্গ অংশ, বিশ্বপরিচয়)।

পিতার কাছ থেকে নেওয়া এই জ্যোতির্বিদ্যার পাঠই কবিকে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করে। ফলস্বরূপ 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকাতেও কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়মিত ছোটদের উপযোগী করে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হত। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশতই তিনি পাঠ করেন Herbert Spencer(1820-1903)-এর 'The Principles of Biology', 'The Principles of Psychology', 'The Study of Sociology', Hermann Helmholtz(1821-1894)-এর 'Popular Lectures on Scientific Subjects', Julius Von Sachs(1832-1897)-এর 'Text Book of Botany'। এছাড়া পাঠ করেন Thomas Henry Huxley(1825-1895), Simon Newcomb(1835-1909), Robert Ball(1840-1913), Sigmund Freud(1856-1939), Max Planck(1858-1947), Carl Gustav Jung(1875-1961), Alfred Adler(1870-1937) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থাবলী। রবীন্দ্রনাথের এই বিজ্ঞানসচেতন মানসিকতা অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সান্নিধ্য এনে দেয়। ১৯২৬ সালে পরিচয় হয় আইনস্টাইনের(১৮৭৯-১৯৫৫) সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে জগদীশচন্দ্র বসু(১৮৫৮-১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায়(১৮৬১-১৯৪৪), মেঘনাদ সাহা(১৮৯৩-১৯৫৬), প্রশান্তচন্দ্র

মহলানবিশ(১৮৯৩-১৯৭২), সত্যেন্দ্রনাথ বসু(১৮৯৪-১৯৭৪) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনার ব্যাপ্তি মুগ্ধ করে আইনস্টাইনকেও। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্যে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করেন। নিজের সমগ্র জীবনের এই বিজ্ঞানভাবনাকে ১৯৩৭ সালে এসে 'বিশ্বপরিচয়' নামে গ্রন্থিতও করেন তিনি। গ্রন্থটি বিজ্ঞান আশ্রিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক – বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলিকে তিনি অত্যন্ত সহজ বাংলায় এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন।

ইউরোপ, জাপান, রাশিয়া ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, বিজ্ঞান ছাড়া বর্তমান যুগ অচল। আমাদের দৈনন্দিন কাজেকর্মে যদি আমারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করি তাহলে অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। সামান্য বিজ্ঞানচেতনার অভাবেই আমারা সহজ কাজ কঠিন করে ফেলছি ও অযথা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি। তাই তিনি জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার প্রসারে যেমন যত্নবান হন তেমনি এর বাস্তব প্রয়োগ করার জন্যে নানা পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্যে শান্তিনিকেতনের পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান আবশ্যিক করেন এবং মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা বলেন। 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'বিজ্ঞানসভা'-তে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন-

> 'যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন
> পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।'[৪]।

তিনি মনে করতেন আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার না করা মানেই পিছিয়ে পড়ার সামিল। এই কারণেই তিনি গান্ধীজীর চরকানীতীর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাই 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত 'চরকা' প্রবন্ধে বলেন-

> 'এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে
> দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না।'[৫]

বাস্তবজীবনে রাশিবিজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা ভেবেই তিনি বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে অনুপ্রাণিত করেন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের এই অনুপ্রেরণাতেই ১৯৩১ সালে প্রশান্তচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট। তিনি চাষাবাদের ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তেমনি চেষ্টা করেন কৃষিনির্ভর গ্রামগুলির আধুনিকীকরণ করতে। এই লক্ষে শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি গবেষণাগার, গ্রামোন্নয়নের জন্যে চালু করেন সমবায় ব্যাঙ্ক। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সুদূর আমারিকায় পাঠান আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবন ও প্রবন্ধের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিজ্ঞানচেতনার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন, বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এর পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তিনি অতি সুকৌশলে তাঁর বিজ্ঞানভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেখা যায় তাঁর কাব্য, গল্প, নাটকের কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে বিজ্ঞানের নানা সূত্র ও লক্ষণ। যেমন- 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি বর্ণনা করেছেন কীভাবে দিবারাত্রি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, কীভাবে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে তৃণাঙ্কুর জেগে উঠছে। কবি লিখেছেন-

> 'আমার পৃথিবী তুমি
> বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকাসনে
> আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
> অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
> সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন

যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি-
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর…’[৬]

আমরা জানি যে, সৌরজগৎ সৃষ্টির পর একগুচ্ছ সংঘর্ষের পর আমাদের এই পৃথিবীর পত্তন ঘটে। সৃষ্টির আদি পর্বে পৃথিবী ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। উল্কাপাত ও অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবী তখন জর্জরিত। পরে ধীরে ধীরে পৃথিবী শান্ত হয়, প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। পৃথিবী ও প্রাণের এই উৎপত্তির ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ‘চিত্রা’ ও ‘পত্রপুট’ কাব্যে। কবি লিখেছেন-

ক) ‘কত যুগ-যুগান্তরের অতীত আভাস,
কত জীবজীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য বাল্যনীহারিকা;
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা;
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব – কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।’[৭](সন্ধ্যা, চিত্রা)

খ) ‘তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে, পুরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশ।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের ’পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পরযুগে -
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের-
জড়ের ঔদ্ধত্য হ’ল অভিভূত;

জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
ঊষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।।'[৮](৩ সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট)

বর্তমান বিশ্বকে দূষণে জর্জরিত হতে দেখে চিন্তিত বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্ববাসীর প্রতি উচ্চারণ করছেন সাবধানবাণীও। কারণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে পৃথিবীর উষ্ণতা, গলছে মেরু অঞ্চলের বরফ। সবুজ পৃথিবীকে কী করে দূষণের কবল থেকে রক্ষা করা যায় তার জন্যে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, হচ্ছে কর্মশালা, আলোচনাচক্রও। অথচ ভাবতে অবাক লাগে পরিবেশ-সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অরণ্য ধ্বংস করে নগরসভ্যতা নির্মাণের তিনি বিরোধী। তাই 'চৈতালি' কাব্যের 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।'[৯]

'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ হাজির করেছেন বিজ্ঞানের গতিবাদকে। এই গ্রন্থের প্রায় সব কবিতাতেই তিনি বিশ্বের নিয়ত চলনশীলতার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ফরাসি দার্শনিক Henri Louis Bergson(1859-1941)-এর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বিশ্ব গতিময় বলেই ৬ সংখ্যক কবিতায় ছবিকে কবি শুধুমাত্র পটে আঁকা ছবি মনে করেননি, তার মধ্যেও সঞ্চার করেছেন গতি। কবি তাই লেখেন-

'কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।'[১০]

তবে বিজ্ঞানের শুধু ইতিবাচক দিকই নয় তার নেতিবাচক দিক সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। 'মুক্তধারা' নাটকে তিনি বিজ্ঞান তথা যন্ত্রসভ্যতার এই অশুভ দিকটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে উত্তরকূটের রাজা বিজ্ঞান তথা যন্ত্রের সাহায্যে শিবতরাইবাসীকে শায়েস্তা করার জন্যে মুক্তধারা ঝর্নাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে। তবে এর জন্যে তিনি বিজ্ঞানকে নয়, দায়ী করেছেন বিজ্ঞানের ব্যবহারকারীকে, দায়ী করেছেন আমাদের ব্যক্তিস্বার্থকে, আমাদের লোভকে। তাই 'কালান্তর' গ্রন্থে তিনি বলেন-

> 'বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রভোলন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পড়িয়া নিজেরেই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে।'[১১]

সাহিত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতেও প্রদর্শিত হয়েছে বিজ্ঞানের নানা সূত্র। যেমন বিজ্ঞানের গতিবাদ ও উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ও বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে সূর্যালোকের সহায়তায় খাদ্য প্রস্তুত করে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে গাছকে অচল মনে হলেও সে কিন্তু অচল নয়, তার মধ্যেও একটি গতি রয়েছে। তাই তার নতুন পাতা গজায়, ফল ও ফুল আসে। গাছ তার এই চলা গোপন রাখে। তাই আমরা সহজে বুঝতে পারি না। এজন্যে বেগবান নদীকে দেখে ছাপা গাছটি বলেছে-

> 'ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
> আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।।
> আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
> আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা।।
> ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
> পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা-
> আমার চলা যায় না বলা – আলোর পানে প্রাণের চলা-
> আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা।।'

জীববিদ্যা হতে আমরা জেনেছি পরাগায়ন বা Pollination-এর প্রক্রিয়াটি। পরাগায়ন আবার দুই প্রকার – (ক)স্ব-পরাগায়ন(Self Pollination) ও (খ)পর-পরাগায়ন(Cross Pollination)। স্ব-পরাগায়নে কোনো ফুলের পরাগ রেণু সেই একই ফুলে অথবা একই উদ্ভিদের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে পর-পরাগায়নে দেখা যায় এখানে পরাগরেণু কোনো মাধ্যম বা বাহক দ্বারা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। এখানে মাধ্যম

হতে পারে বাতাস, পোকামাকড়, পাখি ইত্যাদি। কবি রবীন্দ্রনাথ জীববিদ্যার এই পর-পরাগায়নের বিষয়টি জানতেন। তাই তাঁর 'ওরে গৃহবাসী' গানটিতে ফুলের কাছে গিয়ে মৌমাছি বনবন করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

'বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল, দ্বার খোল।।'

আসলে বিজ্ঞান আমাদের জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত - দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এটি অনুধাবন করেছিলেন। পাশাপাশি বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রেখে কোনো জাতির পক্ষেই উন্নতির শিখরে পৌঁছান সম্ভব নয়। আর সাহিত্যের মাধ্যমে এই বোধটি তিনি মানুষের মধ্যে সঞ্চার করেছেন। এতে কিন্তু সাহিত্যের নান্দনিকতা খর্ব হয়নি, বরং তাঁর সাহিত্য একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে, চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এখানেই তিনি পৃথক।

উল্লেখপঞ্জি :

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী(পঞ্চবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৮
২। জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ভাদ্র ১৪১১, পৃষ্ঠা- ২৯-৩০
৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী(পঞ্চবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৯
৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী(দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- পৌষ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ৫১৯
৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী(চতুর্বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃষ্ঠা- ৪০৫
৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী(তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- কার্তিক ১৩৪৭, পৃষ্ঠা- ১৩৬-১৩৭
৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী(চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- মাঘ ১৩৪৭, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২
৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী(বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- চৈত্র ১৩৬১, পৃষ্ঠা- ১২-১৩
৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী(পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮
১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী(দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- পৌষ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ১৩
১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী(চতুর্বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃষ্ঠা- ৩৯৭